দোলাও আমার হৃদয়

ভালোবাসি... ভালোবাসি...
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি
ভালোবাসি... ভালোবাসি...

তৃষা ভালোবাসতে চেয়েছিল! ভালোবাসা চেয়েছিল, চেয়েছিল ভালো বাসা।

কিন্তু সব সময় আমরা যা চাই তা পাই না।

তৃষা হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? কেন সব ছেড়ে সে ছুটে গিয়েছে হিমালয়ের গহিনে? কাকে ভুলতে চায় সে?

অয়ন লড়ছে মারণ রোগের সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে সবাই ছিল। আজ কেউ নেই। ও কি জিততে পারবে? ও কি ছন্দাকে খুঁজে পাবে?

আর এরিক! সে কেন হিমালয়ের পথে পথে ঘুরছে? এরিক কি পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কার থেকে?

আর ঋত! কেন ঋত তৃষাকে বলতে পারে না মনের কথা? ও কি পারবে তৃষাকে ফিরিয়ে আনতে?

'দোলাও আমার হৃদয়' আমার হৃদয়ের প্রতিটা ভালোবাসার বিন্দু দিয়ে সাজানো এক উপন্যাস। এ উপন্যাসে রয়েছে বাস্তবের গল্প। জীবনের গল্প। ভালোবাসার গল্প। এ উপন্যাস আমাদের কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়। প্রতিটা চরিত্র ভালোবাসার খোঁজে ছুটছে। সেই ভালোবাসা নদীর স্রোতের মতো বহমান।

হাতের মুঠোয় কি জলকে ধরে রাখা যায়? যায় না!

'দোলাও আমার হৃদয়' এক এমন ভালোবাসার গল্প, যা আপনাকে নতুন করে ভাবতে শেখাবে। ভালোবাসতে শেখাবে।

শুভেচ্ছা ও ভালোবাসাসহ।

দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

১

শ্রীখণ্ড পর্বতের চূড়ায় সোনা রং ছড়িয়ে সূর্যটা আজ যেন বড্ড তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আজকেও মনের মতো ছবি তুলতে পারল না এরিক। আজ বেশ কয়েক মাস ধরে ও চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু একটাও মনের মতো সূর্যোদয়ের ছবি তুলতে পারছে না। ঠিক যেই ছবিটা ওর মনের ক্যানভাসে আঁকা আছে, সেটাই তুলবে বলে এত দামি লেন্স আর ক্যামেরাটা কিনেছিল ও। কিন্তু রোজ কিছু না কিছু একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা এপ্রিল মাস, বরফ গলতে শুরু করে দেবে এবার। এরপর আসবে বর্ষা। তখন পাহাড়চূড়া হারিয়ে যাবে মেঘের আড়ালে। আবার সামনের অক্টোবরের পর আবার বরফ পড়া শুরু হলে পাহাড়চূড়াগুলো এমন দুধের মতো সাদা হয়ে উঠবে ধীরে ধীরে। আর সূর্যের প্রথম আলোর কিরণে গলানো সোনার মতো রং ছড়িয়ে পড়বে তাতে। ততদিন আবার অপেক্ষা করতে হবে ওই ছবিটার জন্য।

ছবিটা মনের ক্যানভাসে আঁকা ছিল। কাগজে রং-তুলি দিয়েও এঁকেছে এরিক। কিন্তু সেটাও মনের মতো হয়নি। আর আজকাল রং-তুলি ধরতেই ভালো লাগে না। ছেড়েই দিয়েছিল সব কিছু। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন কিছু জিনিসের। আর সেসবের জন্য চাই রোজগার। অবশ্য ব্যাংকে যা জমানো ছিল তা দিয়ে হয়তো ওর চলে যেত। কিন্তু আজকাল এই সহজ-সরল পাহাড়ের লোকগুলোর সঙ্গে থাকতে থাকতে এরিকের ধূসর জীবনে হালকা রঙের ছোঁয়া আবার ফিরে আসছে। তাই সব কিছু ভুলে আবার হাতে তুলে নিয়েছিল রং-তুলি। কিন্তু সেই আগের মতো বিলীন হয়ে যেতে আর পারে না সৃষ্টির সঙ্গে। যা-ই আঁকে, মনে হয় অসম্পূর্ণ। চেষ্টা করেও মনের মতো রূপ দিতে পারে না নিজের সৃষ্টিকে। একটা অসহায়তা এসে ঘিরে ধরে আজকাল ওকে। ওর

দম আটকে আসে, কষ্ট হয় খুব। যা আঁকতে চায় তা ফুটে ওঠে না। অথচ ওর এই হাতে রং-তুলি একসময় কথা বলত!

আজকাল ক্যামেরার সঙ্গেই বেশিক্ষণ সময় কাটে এরিকের। হিমাচলের এই কিন্নর প্রদেশ শিব ঠাকুরের নিজের দেশ। এখানের প্রকৃতি প্রতিটা ঋতুতে রং বদলায়।

একপাল ভেড়া আর পাহাড়ি ছাগল নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কালিয়া। ছেলেটা দূর থেকে হাত নাড়ে এরিককে দেখে। ওধারের বুগিয়ালের পথে পা বাড়ায় পুরো দলটা। এই বাগানের আপেল আর নাশপাতি গাছগুলোয় ফুল ধরেছে। কদিন আগেও এরিকের জীবনের মতো এদের জীবন ছিল ধূসর, শ্রীহীন। শুকনো ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা আপেল গাছগুলোকে দেখে এরিকের নিজের মতোই লাগত। কিন্তু পার্থক্য হল, দেরিতে হলেও আপেলবাগানে বসন্ত আসে প্রতিবার। কিন্তু এরিকের জীবনের এই বরফ-কঠিন শীতলতা আমৃত্যু ওর সঙ্গী! এর বোধহয় আর কোনো পরিবর্তন নেই!

হঠাৎ এরিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবাক হয়ে চারদিকে তাকায়। সকালের মিষ্টি রোদ, আপেল আর নাশপাতিবাগানের ফাঁক দিয়ে এসে আলপনা আঁকছে ভোরের শিশির-মাখা ঘাসে। চারপাশে তখনও এক নতুন ভোরের মিষ্টি স্নিগ্ধতার রেশ। হিমালয়ের এই সবুজ প্রান্তরে বরফশৃঙ্গ-ঘেরা কিন্নর প্রদেশের আকাশ-বাতাস জুড়ে এক স্বর্গীয় সুর খেলা করছে। সেই সুর লক্ষ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যায় এরিক। পিচফলের বাগানে রং ধরা শুরু হয়েছে সবে। তার ফাঁক দিয়েই এরিকের চোখে ধরা দেয় সেই সুরের স্রষ্টা স্বয়ং... একটা চন্দন রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে আকাশি চুড়িদার-পরিহিতা আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়ে চলেছে কবিগুরুর গান—

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও...

এরিক পায়ে পায়ে কাছে এলেও একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল এই স্বর্গীয় কণ্ঠ। মন হচ্ছিল, কোনো শাপভ্রষ্টা কিন্নরী বা অপ্সরা দেবতার আহ্বানগীত গাইছে। এখনই পাহাড়চূড়ায় হয়তো স্বর্ণরথে করে দেবরাজ এসে এই অপ্সরাকে তুলে নেবে। গান শেষ হলেও রেশ রয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে, গাছের ছায়ায়, পাথরের খাঁজে, আকাশে, বাতাসে। এরিককে অবাক করে কোনো স্বর্ণরথ এল না, মহিলাটি একটা বড়ো পাথরের উপর বসে গাইছিল। হঠাৎ এরিকের মনে হল, মহিলা কাঁদছে। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নার তালে তালে। ও বুঝতে পারে না ওর কী করা উচিত! অপরিচিতা একটা মহিলা এভাবে পাহাড়ের কোলে এসে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে একা একা চোখের জল ফেলছে! এমন অবস্থায় ওর কি এগিয়ে যাওয়া উচিত নাকি ওকে একা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া উচিত...।

ওর সংস্কার, ওর শিক্ষা বাধা হয়ে দাঁড়ায় মাঝখানে। ও ফিরেও আসতে পারে না। এগিয়েও যেতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ পর মহিলা একাই উঠে পড়ে। পাকদণ্ডি পথে নেমে যায় ভীমাকালী মন্দিরের দিকে। এরিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে। মহিলা যখন মন্দিরের গেট দিয়ে ঢুকছে, এরিক নেমে আসে মন্দির লক্ষ করে। আপেলবাগানের ভিতর দিয়ে গিয়ে ছোট্ট ফুলবাগান পার হলেই বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে মন্দিরের দিকে।

প্রথম সারাহানে এসে এরিক কিছুদিন মন্দিরের গেস্ট হাউসেই ছিল। তারপর দেখেশুনে ঘর ভাড়া নিয়ে মিশ্রাজির বাড়ি চলে গিয়েছিল। আজ ছয় মাস মিশ্রাজির বাড়িতেই চিলেকোঠার বড়ো ঘরটা এরিকের ঠিকানা। তবে মন্দিরে মাঝেমধ্যেই আসে এরিক। মন্দির কমিটির অনেকের সঙ্গেই ওর পরিচয় খুব ভালো। তা ছাড়া মন্দিরের ক্যান্টিনে সস্তায় তিনবেলাই ভালো খাবার পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এরিক হাত পুড়িয়ে না রেঁধে এখানেই খেয়ে নেয়।

মহিলাকে গেস্ট হাউসের কাঠের দোতলা বারান্দায় দেখতে পেয়েছিল এরিক। বাঙালি ট্যুরিস্ট সবচেয়ে বেশি আসে এখানে। অবশ্য বাঙালিরাই সবচেয়ে বেশি ঘোরে, এটা এরিক এত বছরে বুঝে গিয়েছে।

গেস্ট হাউসে একটা ইউরোপিয়ান বড়ো গ্রুপ এসেছিল। তাদের কয়েকটা ছেলেমেয়ে সকাল সকাল ছবি তুলতে বেরিয়েছিল। এরিককে দেখে এবং ওর গায়ের সাদা চামড়া আর নীল চোখ দেখে ওকেও নিজেদের দেশের লোক ভেবে আলাপ করতে এগিয়ে এসেছিল দুজন। এরকম মাঝে মাঝেই হয়। এরিক সুপ্রভাত জানিয়ে দু-একটা কথা বলল ওদের সঙ্গে। ওর উচ্চারণেই ওরা বুঝে যায়, কিছু ভুল হচ্ছে। এরিক অল্প হেসে এগিয়ে যায় চৌবেজির ক্যান্টিনের দিকে।

এরিক পলসন, বাবা স্যামুয়েল পলসন, মা কাকলি বিশ্বাস। জন্ম এবং পড়াশোনা শান্তিনিকেতন। পরে অবশ্য কলকাতায়। জন্মসূত্রে বাবার গায়ের রং আর চোখের তারার নীলচে রং ছাড়া আর কিছুই পায়নি সে। বাবা এসেছিল শান্তিনিকেতনে আঁকা শিখতে। মায়ের সঙ্গে সেখানেই আলাপ। মামাবাড়িতে আশ্রিতা অনাথ কাকলিকে ভালোবেসেই ঘর বেঁধেছিল একসময়। মামারা মাথা ঘামায়নি। বিনা পণে যদি ভাগনির একটা গতি হয় এবং সম্পত্তির ভাগ না দিতে হয়, খুশি তো হওয়ার কথাই।

কিন্তু কাকলির ভাগ্যটাই খারাপ। স্যামুয়েল ছিল আত্মভোলা এক আঁকা-পাগল মানুষ। মরণ রোগ বাসা বেঁধেছিল। অথচ সে কাকলিকে বুঝতে দেয়নি। সাত বছরের এরিককে রেখে একদিন চলে গিয়েছিল স্যামুয়েল। তার পরের লড়াইটা কাকলির একার।

ছবি এঁকে, গান গেয়ে ছেলেকে মানুষ করেছিল কাকলি। আঁকাটা জন্মসূত্রে এরিকের রক্তেই ছিল। কলাভবনে জায়গা করে নিতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সেই সময় কাকলিও চলে গিয়েছিল দু-দিনের জ্বরে। এরিক একলা চলার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল।

এরপর বহু ঝড় বয়ে গিয়েছে ছেলেটার উপর, বহু চড়াই-উতরাই পার করে হিমালয়ের কোলে এসে হঠাৎ করে স্থিত হয়েছিল ও। কীসের টানে

নিজেই জানে না, এখানকার পাহাড়ি সরলমতি মানুষগুলোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। এর মাঝের বছরগুলোকে ভুলতে চাইছিল হয়তো, হয়তো সাময়িক বিরতি।

পিছুটান যার নেই, তাকে তো বেঁধে রাখা যায় না এভাবে। যে-কোনোদিন ছোটো ব্যাগ আর আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে গলায় ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে চলে যাবে যেদিকে দু-চোখ যায়। কিছুই ভালো লাগে না মাঝে মাঝে।

দূরের সাদা শৃঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে এরিক আবার ছন্দে ফিরছিল। এই সকালবেলায় চৌবেজি আর ওর বউ নিশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না। চা-জলখাবারের ভিড় এখন। দুজনেই এরিককে দেখে হেসে হাত নাড়ে।

২

ডাক্তার মহাপাত্রর চেম্বারের বাইরে বসে থাকতে থাকতে ছোটো বাচ্চাটার দিকে অয়নের চোখ চলে যাচ্ছিল বারে বারে। মিষ্টি-দেখতে বাচ্চাটা কী সুন্দর কথা বলছে। আগের দিনও ও দেখেছিল বাচ্চাটাকে। একমাথা কোঁকড়া চুল, ফরসা রং, টিকোলো নাক আর নীলচে দুটো চোখ, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। অয়নের কানে ভেসে আসছিল টুকরো টুকরো দুষ্টুমিষ্টি কথা। বাচ্চাটার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আর একজন ফাদার বা ব্রাদার এসেছেন। ওধারের একটা ঘরের সামনে আরও দুটো শিশু দুষ্টুমি করছিল, হঠাৎ অয়নকে দেখে শান্ত হয়ে বসল তারা।

অয়নের মনে হয়, বাচ্চাগুলো আসলে তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। অপারেশনের পর ওর সুন্দর মুখটা এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে অনেকেই দেখে ভয় পায়। প্যারোটিড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডের ক্যানসারটা যখন ধরা পড়ল, বাঁচবে কি না এটাই ছিল অয়নের প্রথম প্রশ্ন। তবে ডা. প্রথম দিন বলেই দিয়েছিল, নিয়মমতো চললে এই ক্যানসারের সারভাইভাল রেট বেশ ভালো। মনের ভিতর চাপ চাপ কষ্টটা কেমন পাক দিয়ে ওঠে আজকাল। এমন সময়

নার্সের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে, ডাক এসেছে আরেকজন পেশেন্টের। আসলে এই নার্সটাকে গত এক বছর ধরে দেখছে অয়ন। ঠিক রোবটের মতো। মুখের শিরা-উপশিরায় কোনো অভিব্যক্তি নেই। গলার স্বরে নেই কোনো সুর। অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এই হাসপাতালের রসকষহীন একটা বিভাগে কাজ করতে করতে হয়তো ও এমন কঠোর হয়ে উঠেছে। কঠিন আবরণে নিজেকে আবৃত করে ফেলেছে।

সামনের কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে বসে যে তিনটি সুন্দরী মেয়ে কম্পিউটারে কাজ করছে, ওদেরও যন্ত্র মনে হয় অয়নের। যদিও ওদের মুখে সর্বদাই হাসি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওদের সর্বদা ওই আলগা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়েই কাজ করতে হবে। সর্বদা ফিটফাট শাড়ি পরে সেজে থাকতে হবে। এ ছাড়া আছে একদল রঙিন প্রজাপতির মতো পিআরও। সর্বদা তারা অয়নের মতো লোকদের তোষামোদ করতে ব্যস্ত। বিরক্ত লাগে অয়নের। হাসপাতালে আসতে কারও ভালো লাগে না, কিন্তু বাধ্য হয়েই আসতে হয়।

বাচ্চাটা লাফাতে লাফাতে ওর একদম সামনে এসে গিয়েছিল। অয়ন ওর দিকে তাকাতেই একগাল হেসে বলল, "হ্যালো, আই অ্যাম ডল।"

অয়ন বহুদিন পর হাসল, কারণ শিশুটা ওকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়নি। ও হেসে বলল, "আই অ্যাম মি. এ জে মল্লিক।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই অসমবয়সির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি নার্সের গলার স্বর ভেসে এল, "মি. মল্লিক..."

ডা. মহাপাত্রর পাঁচতলার এই দুশো স্কোয়্যার ফিটের কেবিনের দুটো দিকই কাচের। ইএম বাইপাস ছাড়িয়ে হায়াত আর যুবভারতী পরিষ্কার দেখা যায়। কলকাতার এদিকটা বড্ড সাজানো-গোছানো। বেশ ভালোই লাগে দেখতে। ব্লাড রিপোর্ট আর অন্যান্য কাগজ ডাক্তারের টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে, উনি একবার চোখ তুলে ইশারায় অয়নকে বসতে বলেই রিপোর্টে ডুবে গেলেন।

অয়ন এক বছর ধরে প্রায় নিয়মিত ওঁর কাছে আসছে। একটু একটু করে আশার আলো আজকাল আবার দেখতে পাচ্ছে সে।

কিন্তু একেক সময় মনে হয়, কার জন্য বাঁচবে? কীসের জন্য বাঁচবে? কেউ

তো বসে নেই তার পথ চেয়ে। তাহলে ভাগ্যের সঙ্গে এই অসম লড়াই করে কী লাভ? জমানো টাকাগুলোও শেষ হয়ে যাবে একদিন। নতুন করে আর কিছু করার কথা ভাবতে ভয় লাগে! অথচ ভিতর থেকে কে একটা চিৎকার করে বাঁচতে চায়। অয়ন এক বছর ধরে একাই নিজের চিকিৎসা করাচ্ছে।

প্রথম প্রথম কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। একে একে সবাই হাত ছেড়েছে। কেমো নেওয়ার পর দুর্বল শরীরে বাড়ি ফিরতে পারত না একা। দুটো দিন হাসপাতালের বেডেই শুয়ে কাটাতে হয় তাই। ইনশিয়োরেন্সটা ছন্দা একসময় জোর করে করিয়েছিল, সেটাই কাজে লেগে গিয়েছিল। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগটা কোনোকালেই ছিল না। অসুস্থতার খবর শুনে কয়েকজন ফোনে খোঁজ নিয়েছিল। অতটুকুই।

"আপনি তো ভালোই রিকভার করছেন, মি. মল্লিক। বাঃ, সব রিপোর্ট বেশ ভালো। তাহলে নেক্সট উইকে লাস্ট কেমোটা নিয়ে নিন। সেভাবেই ব্যবস্থা করি?" ডা. মহাপাত্রর কথায় বর্তমানে ফেরে অয়ন। মাথা ঝাঁকায় অল্প।

ডা. ব্যানার্জি খসখস করে কিছু লিখেই নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট পবনকে ডেকে সব বুঝিয়ে দেন।

এই পবন এর আগেও সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অয়নের অবস্থাটা ও জানে। এত বড়ো মারণ রোগেও যে ও একা, সেটা ও প্রথম দিনই বলে দিয়েছিল ডাক্তারকে।

অল্প হেসে পবন বলে, "তাহলে পরশু ভরতির ব্যবস্থা করি?"

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অয়ন বাইরে বেরিয়ে আসে। না, সেই বাচ্চাটাকে আর কোথাও দেখতে পায় না।

৩

আজ পাঁচ দিন হল এখানে এসেছে তৃষা, এই কিন্নর প্রদেশ সাদা আর সবুজের মেলবন্ধন ওর মন কেড়ে নিয়েছে। বহুদিন পর মনটা খুব হালকা লাগছে ওর।

এই সারাহানে বহু বছর আগে একবার এসেছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে। এবার